CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

HSB
স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ৪ সংখ্যা ১ আইএসএসএন১৭২৯-৩৪৩এক্স মার্চ ২০০৬

ভেতরের পাতায় . . .

৬ বাংলাদেশে রোটাভাইরাসের ফলে আনুমানিক মৃতের সংখ্যা

১০ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নবজাতক শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি

১৬ সার্ভিলেন্স আপডেট

আইসিডিডিআর,বি:
সেন্টার ফর হেলথ্ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
জিপিও বক্স ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org

ঢাকায় জনসংখ্যানির্ভর ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্স

ঢাকা শহরের কমলাপুর এলাকায় বসবাসরত পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের প্রকোপের ওপর আমরা একটি সার্ভিলেন্স পরিচালনা করেছি। ২০০৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহে আক্রান্ত শিশুদের শ্বাসতন্ত্র থেকে নির্গত লালা (রেসপিরেটরি সিক্রেশন) পরীক্ষা করে ১৪% শিশুর শ্বাসতন্ত্রে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সনাক্ত করা হয়েছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সংক্রমণের হার ছিলো বছরে প্রতি ১,০০০ শিশুর মধ্যে ৮৪.৫ বার। জীবাণুসমূহের ৫৮% ছিলো ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (এইচ৩এন২ এবং এইচ১এন১) এবং ৪২% ছিলো ইনফ্লুয়েঞ্জা বি (সাংহাই এবং হংকং)। এশিয়ার মধ্যে চক্রাকারে পরিবাহিত ইনফ্লুয়েঞ্জা এ-র উভয় জীবাণু এবং বি-র উভয় জীবাণু বাংলাদেশেও চক্রাকারে পরিবাহিত হচ্ছে।

১৯১৮ থেকে ১৯১৯ সালে বিশ্বব্যাপি (প্যানডেমিক) ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সংক্রমণে ভারতবর্ষে প্রায় এক কোটি এবং সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় চার কোটি মানুষের প্রাণহানি ঘটে। যে কারণে এই বিশেষ প্রজাতির (স্ট্রেইন) ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণুটি অত্যন্ত ভয়ংকর এবং উচ্চ হারে প্রাণ-সংহারক তা এখনো পরিস্কার নয়, যদিও সাম্প্রতিককালে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, এটি একটি এভিয়ান ভাইরাস যা মানুষের শরীরে সরাসরি অভিযোজিত (অ্যাডাপটেশন) হয়ে মানুষের মধ্যে পরিবাহী একটি জীবাণুতে রূপান্তরিত হয় (১)। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস প্রায়শই এর আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্তন করে এবং এ-কারণে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে নেওয়া টিকা পূর্ব-সংক্রমণ অথবা নতুন জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধক নাও হতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণুর ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি পরিবর্তিত হয়ে অন্য প্রজাতির জীবাণুর মধ্যে অভিযোজিত হয়। যখন একজন ব্যক্তি একই সাথে মানুষের মধ্যে পরিবাহী এবং এভিয়ান প্রজাতির ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের আকার ও প্রকৃতির পরিবর্তন এবং উৎপত্তি-বিষয়ক বস্তুর পরিবর্তনের মাধ্যমে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসটি অন্য কোনো প্রাণীকে সার্থকভাবে সংক্রামিত করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

১৯৯৬ সাল থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (এইচ৫এন১)-এর একটি নতুন প্রজাতি পূর্ব-এশিয়ায় গৃহপালিত হাঁস-

মুরগী এবং বন্য পাখির মধ্যে পরিবাহিত হয়ে আসছে (২)। এ-সংক্রমণ চীনের গুয়াংডং এবং হংকং-এ সর্বপ্রথম ধরা পড়ে। সেই থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (এইচ৫এন১) ভাইরাসটি ২১টি দেশের গৃহপালিত হাস-মুরগী এবং ২০টি দেশের বন্য পাখির মধ্য থেকে সনাক্ত করা হয় (৩)। ২০০৪ সালের জানুয়ারি এবং ২০০৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে গবেষণাগারের পরীক্ষায় ১৭৩ জন রোগীর মধ্যে উল্লিখিত ভাইরাসের প্রমাণ পাওয়া গেছে, যাদের মধ্যে ৯৩ জন রোগী মারা যায় (৪)। এ-পর্যন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণুর এ-প্রজাতিটি এভিয়ান ভাইরাস হিসেবে আছে যা মানুষের মধ্যে দুর্বলভাবে বাসা বাঁধে। মানুষের মধ্যে অধিকাংশ রোগী ছিলো যারা সরাসরি আক্রান্ত হাঁস-মুরগীর সংস্পর্শে এসেছিলো। ১৯৯৬ সালে ভাইরাসটি যখন প্রথম আবির্ভূত হয় তখন থেকে এই এইচ৫এন১ ভাইরাসটির রূপান্তরিত হওয়ার কথা জানা যায় (৫)। যখন মনে হয় যে, ভাইরাসটির এসব রূপান্তরের ফলে বন্য এবং গৃহপালিত পাখির মধ্যে এটির সংক্রমণ প্রক্রিয়া (ট্রান্সমিশন প্যাটার্ন) প্রভাবান্বিত হয়, তখন মানুষের ওপর রূপান্তরিত ভাইরাসসমূহের প্রভাব দৃশ্যত দেখা যায় নি। ভাইরাসটি পাখি থেকে মানুষে অথবা মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে খুব সহজে এখনো সার্থকভাবে বিস্তার লাভ করে না। তথাপি, ইতোপূর্বে বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য যে জীবাণুটি দায়ী, সেটি মানুষের মধ্যে সার্থকভাবে সংক্রমণ ঘটাতে সমর্থ।

বাংলাদেশ সেসব দেশসমূহের সন্নিকটে অবস্থিত যেসব দেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা গেছে। বাংলাদেশের সর্বত্র গৃহপালিত হাঁস-মুরগীর খামার রয়েছে, যার ফলে এগুলোর উৎপাদন বেড়ে গেছে। প্রাথমিক অবস্থায় পারিবারিক পর্যায়ে কিছু মুরগী লালন-পালন করা হতো এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত ডিম ও মাংস দিয়ে নিজেদের চাহিদা মেটানো হতো। পরবর্তীতে এটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যারা নিজেদের চাহিদা মেটানোর পর কিছু ডিম ও মাংস তাদের প্রতিবেশিদের মধ্যে বিক্রি করা শুরু করে এবং এভাবে বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে এ-ব্যবসার উত্তরণ ঘটে। বাংলাদেশের অনেক অধিবাসী নিয়মিতভাবে জীবিত হাঁস-মুরগীর সংস্পর্শে আসে। ছোট ছোট শহরভিত্তিক রাষ্ট্রসমূহ বাদে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি (৬)। তাই অধিকাংশ দেশের তুলনায় বাংলাদেশ থেকে উত্থিত নতুন ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণু দ্বারা অনেক বেশি ঝুঁকি সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস দ্বারা শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত শিশুদের আনুপাতিক হার নির্ণয়ের লক্ষ্যে এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণুর যেসব প্রজাতি ঢাকা শহরে পরিব্যাপ্ত সেগুলোর চারিত্রিক গঠন নির্ণয়ের জন্য আমরা ঢাকা শহরে ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস সংক্রমণের ওপর জনসংখ্যা-নির্ভর একটি সার্ভিলেন্স পরিচালনা করেছি।

কমলাপুর ঢাকা শহরের একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, যেখানে স্বল্প আয়ের লোকজন বসবাস করে। সমগ্র এলাকটিকে ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা ৩৭৭টি ছোট ছোট এলাকায় (ক্লাস্টার) বিভক্ত করা হয়। এগুলোর মধ্য থেকে সার্ভিলেন্সে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ১৬৮টি ছোট ছোট এলাকা (ক্লাস্টার) দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত বাড়িসমূহের মধ্যে যেগুলোতে পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশু ছিলো, মাঠকর্মীরা সেসব বাড়ি নির্বাচন করে সেগুলোকে সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। যেসব শিশু সার্ভিলেন্স এলাকায় নতুন জন্মগ্রহণ করেছে অথবা অন্য কোথাও থেকে সেখানে এসেছে তাদেরকেও সার্ভিলেন্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একজন শিশুর বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হলে (৫ম জন্মদিন) তাকে আর পর্যবেক্ষণ করা হয় নি।

২০০৪ সালের শুরুতে পাঁচ বছরের কম-বয়সী আনুমানিক ৫,০০০ শিশু নিয়মিত সাপ্তাহিক

সার্ভিলেন্সের আওতাভূক্ত ছিলো। প্রত্যেক সপ্তাহে ৪০ জন মাঠকর্মী এই সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি বাড়ি পরিদর্শন করেছেন এবং একটি মানসম্মত প্রশ্নমালার মাধ্যমে পূর্ববর্তী পরিদর্শনের পর থেকে সপ্তাহের প্রতিদিন প্রত্যেক শিশুর অসুস্থতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যেসব অসুস্থ শিশুর মধ্যে জ্বর (নিজেরা পরিমাপ করে অথবা অভিভাবকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী), দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, শ্বাসকষ্ট (ল্যাবার্ড ব্রিদ্রিং) অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় শব্দ হওয়া, নেতিয়ে পড়া, শরীর নীল হয়ে যাওয়া (সাইনোসিস), পান করতে অসমর্থতা বা খিচুঁনি, ইত্যাদি বিভিন্ন মারাত্মক রোগের লক্ষণ ছিলো তাদেরকে রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য আইসিডিডিআ,বি-র কমলাপুর ক্লিনিকে পাঠানো হয়। একইভাবে যদি কোনো শিশুর মধ্যে কাশি, অনবরত নাক দিয়ে সর্দি পড়া (রানি নোজ), গলা ব্যাথা (সোর থ্রোট), মাংসপেশী অথবা দেহের সন্ধিস্থলে ব্যাথা, কাঁপুনি (চিল্ড), মাথাব্যাথা, বিরক্তিভাব বা অস্থিরতা, কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া বা বমি বমি ভাবসহ সামান্য রোগের দু'টি লক্ষণ একসংগে দেখা গেছে, তাহলে তাকেও ক্লিনিকে পাঠানো হয়েছে। ক্লিনিকে রোগীর চিকিৎসাসহ রোগ নির্ণয়-সংক্রান্ত সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনা খরচে করা হয়েছে। মাঠকর্মীদের বাড়ি পরিদর্শনের নির্দিষ্ট দিন ছাড়া অন্য দিনগুলোতে সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী পরিবারসমূহে কোনো শিশুর অসুস্থতা-সংক্রান্ত কোনো লক্ষণ দেখা দিলে পরিবারের পক্ষ থেকে স্ব-উদ্যোগে তাকে ক্লিনিকে নিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

ক্লিনিকের চিকিৎসকগণ মানসম্পন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনে আরো গবেষণার ব্যবস্থা করেছেন। এক্সিলারি তাপমাত্রা (≥৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের হার-বৃদ্ধির (৬০ দিনের কম-বয়সী শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের হার মিনিটে ৬০ বার বা তার বেশি, ৬০ থেকে ৩৬৫ দিন বয়সের ক্ষেত্রে মিনিটে ৫০ বার বা তার বেশি এবং এক থেকে পাঁচ বছর বয়সের ক্ষেত্রে মিনিটে ৪০ বার বা তার বেশি) সাথে অন্তত একটি শ্বাসতন্ত্রের রোগের লক্ষণ, যেমন– কাশি, বুক ডেবে যাওয়া (চেস্ট-ইনড্রইং), শ্বাস নেওয়ার সময় ঘর ঘর শব্দ হওয়া (ইনস্পিরেটরি ক্রিপিটেশন), শ্বাস ছাড়ার সময় বাঁশির মত শব্দ (এক্সপিরেটরি হুইজ) বা শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বুকের ভেতরে শব্দ করাকে (রংকাই– যা স্ট্রেথোসকোপের সাহায্যে শোনা যায়) শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহজনিত তীব্র সংক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সার্ভিলেন্স এলাকার যেসব শিশু তীব্র শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছিলো তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক পঞ্চম শিশুর নাকধোঁয়া (নেসোফ্যারিনজাল ওয়াস) পানির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই নাকধোঁয়া পানির নমুনার একটি অংশ আইসিডিডিআর,বি-র ভাইরোলজি ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে টিসু কালচার করা হয়েছে। এই প্রজনন প্রক্রিয়ার সাইটোপ্যাথিক ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, ইনফ্লুয়েঞ্জা এ এইচ১এন১ ও এইচ৩এন২ এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা বি সাংহাই ও হংকং সনাক্ত করার জন্য টিসু কালচার সুপারনেট্যান্ট সংগ্রহ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসম্মত ইনফ্লুয়েঞ্জা রিএজেন্ট কিটের মাধ্যমে সেগুলোর হেমাগ্লুটিনেশন পরীক্ষা করা হয়েছে।

২০০৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে কমলাপুর ক্লিনিকে ৪৪,২৫৬ জন শিশুকে পরীক্ষা করা হয়। এদের মধ্যে ৫,১২৯ জন উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহজনিত তীব্র সংক্রমণে আক্রান্ত ছিলো। এদের ১,০২৬ জনের কাছ থেকে নাক ধোয়া পানির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিলো, যার ৮১৬টির পরীক্ষার ফল পাওয়া গেছে।

এ পর্যন্ত পরীক্ষিত ৮১৬টি নাক ধোয়া পানির নমুনা থেকে ১১৩টির (১৪%) মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস পাওয়া গেছে। পাঁচ বছরের কম-বয়সী এই জনসংখ্যার মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা-সংক্রান্ত

শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের হার ছিলো প্রতি বছর ১,০০০ জন শিশুর মধ্যে ৮৪.৫ বার। ২০০৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে ৫৮% জীবাণু ছিলো ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (এইচ৩এন২, এইচ১এন১) এবং ৪২% ছিলো ইনফ্লুয়েঞ্জা বি (সাংহাই এবং হংকং)।

চিত্র ১: কমলাপুরে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের আইসোলেটের বিন্যাস: এপ্রিল ২০০৪ থেকে নভেম্বর ২০০৫

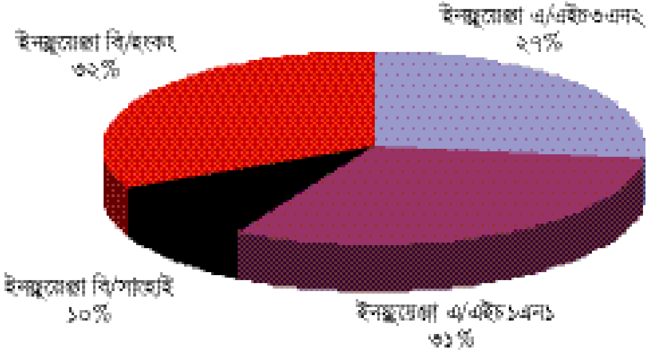

সারা বছর ধরেই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সনাক্ত করা হয়েছে, তবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ইনফ্লুয়েঞ্জা পাওয়া গেছে এপ্রিল, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে।

চিত্র ২: মৌসুম অনুযায়ী ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস: কমলাপুর, বাংলাদেশে

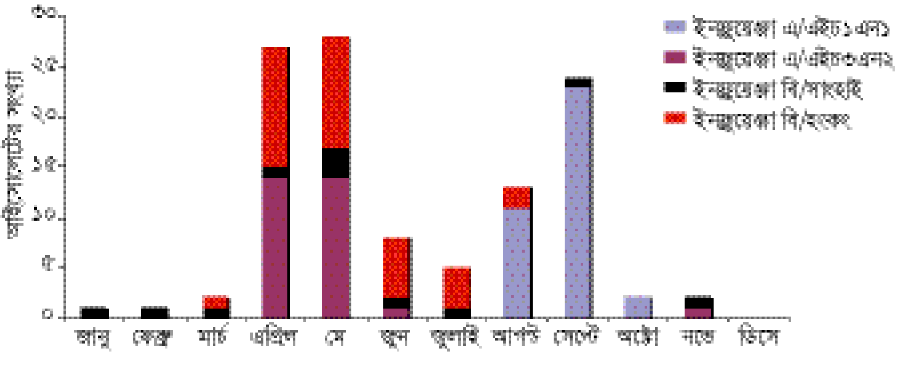

প্রতিবেদক: প্রোগ্রাম অন ইনফেকশাস ডিজিজেজ অ্যান্ড ভ্যাকসিন সায়েন্স, এইচএসআইডি, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, ইউএসএ

মন্তব্য

কমলাপুরে পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্বাসতন্ত্রের জীবাণু। যেহেতু বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুমৃত্যুর একটি বড় কারণ নিউমোনিয়া (৭),

শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণজনিত শিশুমৃত্যুর হার কমানো-সংক্রান্ত কার্যাবলির সাথে তাই ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধের কলাকৌশলসমূহও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে পরিবাহিত ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাসের উভয় জীবাণু এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা বি ভাইরাসের উভয় জীবাণু বাংলাদেশের মধ্যেও পরিবাহিত হচ্ছে। এ-থেকে বোঝা যায় যে, এইচ৫এন১ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা যদি বাংলাদেশের হাঁস-মুরগীর খামারসমূহের মধ্যে পরিবাহিত হয়, তাহলে এভিয়ান ও মানুষের মধ্যে পরিবাহী এই দুই প্রকার ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দ্বারা বাংলাদেশের মানুষের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইনফ্লুয়েঞ্জার অন্যান্য জীবাণুও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে রোগ সৃষ্টি করতে পারে, যদিও আলোচ্য সার্ভিলেন্স এলাকাটি একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট অ্যান্টিসিরা শুধুমাত্র উল্লিখিত চারটি জীবাণু নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

যদিও অধিকাংশ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে নির্ণয় করা হয়েছে, তবে সারা বছর ধরে এটির সংক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এটি বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হতে পারে, কারণ পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে তাপমাত্রা বেশি সেসবের বেশিরভাগ অঞ্চলেই বর্ষা মৌসুমের শেষ দিক থেকে শীত মৌসুম (নভেম্বর থেকে মার্চ) পর্যন্ত এ রোগের সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের মতো জনসংখ্যাভিত্তিক অঞ্চলের জনগণ এ-ভাইরাসের একটি সম্পুরক ধারক হিসেবে কাজ করতে পারে, যেখানে এ-ভাইরাসটি পরিবাহিত থাকা অবস্থায় এর আকার-আকৃতি (মিউটেশন) পরবর্তী মৌসুম পর্যন্ত পরিবর্তন করার সুযোগ পায়।

এখানে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ যদি অন্যান্য স্থানের জন্যও সত্যি হয়, তাহলে বছরের একটি বিশেষ মৌসুমে ভাইরাসটির অনেক বেশি হারে সংক্রমণ ঘটানো রোধকল্পে বাংলাদেশে বছরের প্রারম্ভে ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা দেওয়া প্রয়োজন।

এই উপাত্তসমূহ পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ওপর সংগৃহিত। বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাস্থ্যের ওপর ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রভাব এখনো অজানা। তবে শিশুদের মধ্যে এর সংক্রমণের উচ্চ হার এবং এর অনেকগুলো প্রজাতির সংক্রমণের ক্ষমতা থেকে বোঝা যায় যে, ভাইরাসটি বড়দের মধ্যেও শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ সৃষ্টির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবাণু হিসেবে কাজ করতে পারে। এ-ব্যাপারে আরো গবেষণা সমস্যার গভীরতা বিশ্লেষণ এবং স্বল্পব্যয়ে নিয়মিত ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা দেওয়ার পন্থা উদ্ভাবনে সমর্থ হতে পারে।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন।

বাংলাদেশে রোটাভাইরাসের ফলে আনুমানিক মৃতের সংখ্যা

বাংলাদেশে রোটাভাইরাসের ফলে যে পরিমাণ শিশু মারা যায় তার একটি আনুমানিক হিসাব আমরা বের করেছি। ডায়রিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা বের করার জন্য আমরা বাংলাদেশ জনমিতি এবং স্বাস্থ্য সমীক্ষা ২০০৪-এর উপাত্ত থেকে পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুমৃত্যুর হার এবং এরমধ্যে ডায়রিয়ায় মৃত্যুর অনুপাতকে ব্যবহার করেছি। প্রাপ্ত সংখ্যার (ডায়রিয়ায় মৃত্যু) সাথে ঢাকা ও মতলবের সার্ভিলেন্স এলাকায় রোটাভাইরাসের ফলে সংঘটিত ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাকে গুণ করা হয়। আমাদের হিসাব অনুযায়ী ২০০১ এবং ২০০৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশে মারাত্মক রোটাভাইরাসজনিত ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ছিলো প্রতিবছর আনুমানিক ৫,৭৫৬ এবং ১৩,৪৩০-এর মধ্যে। কমদামী (মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে) একটি কার্যকর রোটাভাইরাস ভ্যাকসিন প্রতি বছর বাংলাদেশে হাজার হাজার মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারে।

কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে মারাত্মক ডায়রিয়ার অন্যতম একটি প্রধান কারণ হচ্ছে রোটাভাইরাস। বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর পাঁচ বছরের কম-বয়সী আনুমানিক পাঁচ লক্ষাধিক শিশু রোটাভাইরাসে মারা যায় (১)। বড় ধরনের গবেষণায় দু'টি নতুন ভ্যাকসিন মারাত্মক রোটাভাইরাস রোগ-প্রতিরোধে নিরাপদ এবং কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে (২,৩)। যথেষ্ট পুষ্টিসম্পন্ন রোগীদের ওপর এসব গবেষণা পরিচালিত হয়, তবে বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত স্বল্প-আয়ের জনগোষ্ঠিতে অধিকতর অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে বর্তমানে পরিচালিত গবেষণাসমূহসহ আরো গবেষণা পরিচালিত হবে বলে আশা করা যায়। রোটাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা-সম্পর্কিত উপাত্ত নীতিনির্ধারকদেরকে তাদের দেশে ভ্যাকসিনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে।

১৯৯০ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ইউনিকম্ব এবং তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত ইতোপূর্বেকার এক গবেষণা থেকে ধারণা করা হয়েছিলো যে, বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালে জন্মগ্রহণকারী ৩০ লক্ষ বাংলাদেশী শিশুর মধ্যে ১৪,৮৫০ থেকে ২৭,০০০ শিশু তাদের পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে রোটাভাইরাসে মারা যাবে। প্রতি ১১১ থেকে ২০৩ জন শিশুর মধ্যে এক জন শিশুর রোটাভাইরাসে মৃত্যুর সাথে এ-ধারণাকে তুলনা করা যায় (৪)। তবে ১৯৯০ দশকের গোড়া থেকে ডায়রিয়ার ফলে শিশুমৃত্যুর অনুপাত কমে আসছে (৫)। বাংলাদেশে নতুন কোনো রোটাভাইরাস ভ্যাকসিন প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তার ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রোটাভাইরাস রোগ-সংক্রান্ত সর্বশেষ অনুমিত মৃতের সংখ্যা জানা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ডায়রিয়ার ফলে শিশুমৃত্যু এবং রোটাভাইরাস থেকে সৃষ্ট মারাত্মক ডায়রিয়ার ফলে মৃত্যুবরণকারীদের অনুপাত-সংক্রান্ত অধিকতর সাম্প্রতিক উপাত্ত ব্যবহার করে আমরা বাংলাদেশে রোটাভাইরাসের ফলে মৃতের সংখ্যা পুনর্মূল্যায়ন করেছি।

মতলব এবং ঢাকায় আইসিডিডিআর,বি-র দু'টি হাসপাতাল রয়েছে যেখানে ডায়রিয়া রোগীদের চিকিৎসা করা হয়। এ-হাসপাতাল দু'টিতে আগত বেশিরভাগ রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হয় বহির্বিভাগে। তবে মারাত্মক অসুস্থ রোগীদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সুতরাং গবেষণার জন্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মারাত্মক ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের মধ্য থেকে সংগৃহীত নমুনা ব্যবহার করা ছিলো যথেষ্ট যুক্তিসংগত। রোটাভাইরাস এবং অন্যান্য জীবাণু সম্পর্কে জানার জন্য ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ঢাকা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্য থেকে পদ্ধতিগত নমুনা হিসাবে শতকরা চার ভাগ রোগীর মল পরীক্ষা করা হয়। ১৯৯৫ সালের পর নমুনার সংখ্যা শতকরা দু'ভাগে নামিয়ে আনা হয়। ২০০০ সালে মতলবে কর্মরত সার্ভিলেন্স এলাকা (জনসংখ্যা ২২০,০০০) থেকে মতলব হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা সব ডায়রিয়া রোগীরই মল পরীক্ষা করা হয়।

ঢাকা ও মতলব উভয় হাসপাতালের অন্তর্গত সার্ভিলেন্সে নথিভুক্ত রোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত মলের নমুনাসমূহে রোটাভাইরাসের জীবাণু আছে কি না তা জানার জন্য এনজাইম-লিংকড

চিত্র ১: ১৯৯৩ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা হাসপাতালে ভর্তি হওয়া পাঁচ বছরের কম-বয়সী ১৮,৫৪৪ জন ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুর মলের নমুনা থেকে পাওয়া বিভিন্ন জীবাণু বা পরজীবী

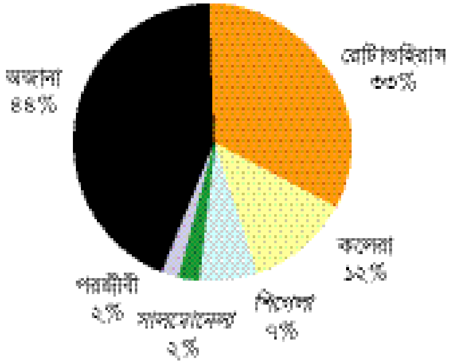

ইম্মিউনোসরবেন্ট অ্যাসে (এলিসা) দ্বারা আইসিডিডিআর,বি-র ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশনের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়। ১৯৯০ দশকের শুরু থেকে এ-পর্যন্ত এই পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন হয় নি। একই নমুনাসমূহে *সালমোনেলা* (এন্টারিক মিডিয়া), *শিগেলা* (ম্যাককনকি অ্যাগার), *ভিবরিও কলেরি* O১ এবং O১৩৯ (টিসিবিএস অ্যাগার), *জিয়ারডিয়া ল্যাম্বলিয়া, এন্টাঅ্যামিবা হিস্টোলাইটিকা* এবং *ক্রিপটোসপরিডিয়ামের* (মাইক্রোসকোপিক অ্যাসে এবং এলিসা) জীবাণু বা পরজীবী আছে কি না তা জানার জন্য সেগুলো নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হয়।

১৯৯৩ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা হাসপাতালে ভর্তি হওয়া পাঁচ বছরের কম-বয়সী মোট ১৮,৫৪৪ জন ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুকে সার্ভিলেন্সের আওতায় আনা হয়। এদের ৩৩% ছিলো রোটাভাইরাসে আক্রান্ত, ২১% ছিলো *ভি. কলেরি, শিগেলা* এবং *সালমোনেলাস*হ বিভিন্ন রকম জীবাণুতে আক্রান্ত, শতকরা দুই ভাগ ছিলো বিভিন্ন রকম পরজীবীতে আক্রান্ত এবং ৪৪% রোগীর মধ্যে কোনো রোগের জীবাণু পাওয়া যায় নি (চিত্র ১)।

১৯৯৩ সাল থেকে আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকা হাসপাতালে ভর্তি হওয়া পাঁচ বছরের কম-বয়সী রোটাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অবিচলভাবে বাড়তে থাকে। ১৯৯৩ সালে এ-অনুপাত যেখানে ছিলো ২০% তা ২০০৪ সালে ৪০% ছাড়িয়ে যায় (চিত্র ২)। রোটাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এই সময়ে বাড়ে নি। এ-থেকে বোঝা যায় যে, রোটাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর অনুপাত বেড়ে যাওয়ার ফলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ডায়রিয়া রোগীর মধ্যে রোটাভাইরাস ছাড়া অন্য কারণে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কমে গেছে।

চিত্র ২: ১৯৯৩ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকা হাসপাতালে ভর্তি হওয়া পাঁচ বছরের কম-বয়সী রোটাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ও শতকরা হিসাব

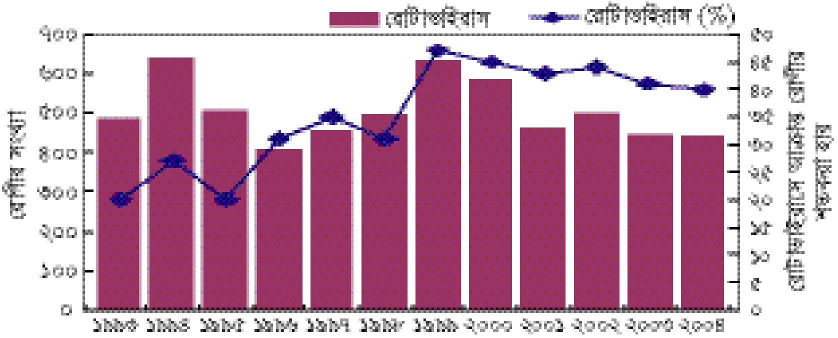

মতলব হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ডায়রিয়া রোগী-সম্পর্কিত জীবাণুর উপাত্ত ঢাকা হাসপাতালের মতো একই রকমের। ২০০০ এবং ২০০৪ সালের মধ্যে মতলব ডেমোগ্রাফিক সার্ভিলেন্স থেকে মতলব হাসপাতালে ভর্তি হওয়া পাঁচ বছরের কম-বয়সী ডায়রিয়া রোগীদের ৩৫% ছিলো রোটাভাইরাসে আক্রান্ত (এলিসা অ্যাসে দ্বারা পরীক্ষিত মলের নমুনা থেকে পাওয়া)।

২০০৫ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিলো আনুমানিক ১৪ কোটি ২০ লক্ষ এবং স্থুল জন্ম হার ছিলো প্রতি হাজারে ২৬.৪ জন (৬)। এ-হিসাব অনুযায়ী ২০০৫ সালে বাংলাদেশে আনুমানিক ৩৭ লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করে। বাংলাদেশ জনমিতি এবং স্বাস্থ্য সমীক্ষার হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুমৃত্যুর বাৎসরিক হার প্রতি হাজারে আনুমানিক ৮৮ জন (৭), এবং ২০০৫ সালে পাঁচ বছরের কম-বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ছিলো এক কোটি ৭১ লক্ষ। বাংলাদেশ জনমিতি এবং স্বাস্থ্য সমীক্ষা ২০০৪ সালে মানুষের মৃত্যুর কারণসমূহ নতুন ভাবে শ্রেণীবিন্যাস করেছে। এর উদ্দেশ্য ছিলো শিশুমৃত্যু-সম্পর্কিত অজ্ঞাত কারণসমূহ কমিয়ে আনা। এ-নতুন পদ্ধতিতে দেখা গেছে যে, পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে ৫.১% ছিলো ডায়রিয়া আক্রান্ত এবং ৬.৮% ছিলো শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, ডায়রিয়া এবং সম্ভাব্য মারাত্মক সংক্রমণসমূহের সম্মিলিত আক্রমণে আক্রান্ত (৫)। রোটাভাইরাসে মৃত্যুজনিত সমস্যা আনুমানিক কম হওয়ার ফলে আমাদের ধারণা এই যে, কেবলমাত্র ডায়রিয়ায় মৃত্যুবরণকারী ৫.১% শিশুর মধ্যে সামান্য কিছু অংশ হয়ত রোটাভাইরাসে মারা যায়। বেশি ঝুঁকির ক্ষেত্রে আমাদের ধারণা– রোটাভাইরাসে মৃত্যুর পরিমাণ কেবলমাত্র ডায়রিয়া এবং তীব্র শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের সাথে সম্মিলিতভাবে ডায়রিয়ায় মৃত্যুর সমপরিমাণ হতে পারে। আমাদের ধারণা, বাংলাদেশে মৃত্যুবরণকারী ডায়রিয়া রোগীদের মধ্যে যে পরিমাণ রোটাভাইরাসজনিত ডায়রিয়া রোগী ছিলো, ২০০০ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে আইসিডিডিআর,বি-র মতলব এবং ঢাকার হাসপাতালসমূহের ডায়রিয়া রোগীদের মধ্যেও একই আনুপাতিক হারে রোটাভাইরাসজনিত ডায়রিয়া রোগী ছিলো। রোটাভাইরাসের ফলে সৃষ্ট মারাত্মক ডায়রিয়ার অনুপাত যেহেতু অন্য কারণে সৃষ্ট ডায়রিয়ার মত নয় (৮,৯), সেহেতু এটি একটি রক্ষণশীল ধারণা। উল্লিখিত দু'টি হিসাব একসংগে ধরে এ-গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে ২০০১ এবং ২০০৪ সালের মধ্যে মারাত্মক রোটাভাইরাসজনিত ডায়রিয়ায় প্রতিবছর আনুমানিক ৫,৭৫৬ থেকে ১৩,৪৩০ জন শিশু মারা গেছে (সারণি ১)। এ-হিসাব থেকে বলা যায় যে, প্রতি ২৭৫ থেকে ৬৪২ জন শিশুর মধ্যে একজন শিশু রোটাভাইরাসজনিত ডায়রিয়ায় মারা যায়।

সারণি ১: বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে রোটাভাইরাসে মৃত্যুর ব্যাপকতা পরিমাপ-সংক্রান্ত পরীক্ষা

	নিম্ন অনুমান	উচ্চ অনুমান
বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুর সংখ্যা	১৭,১০০,০০০	১৭,১০০,০০০
পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুমৃত্যুর হার	০.০৮৮	০.০৮৮
পাঁচ বছরের মৃত্যুহারকে বার্ষিক হিসাবে প্রকাশ	০.২	০.২
ডায়রিয়ার কারণে মৃতের অনুপাত	০.০৫১	০.১১৯
রোটাভাইরাসের কারণে মৃতের অনুপাত	০.৩৭৫	০.৩৭৫
রোটাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা	৫,৭৫৬	১৩,৪৩০

প্রতিবেদক: প্রোগ্রাম অন ইনফেকশাস ডিজিজেজ অ্যান্ড ভ্যাকসিন সায়েন্সেস, আইসিডিডিআর,বি; ইমোরি ইউনিভারসিটি রোলিন্স স্কুল অব পাবলিক হেলথ; সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, ইউএসএ

অর্থানুকূল্য: আইসিডিডিআর,বি এবং ইমোরি ইউনিভারসিটি রোলিন্স স্কুল অব পাবলিক হেলথ; সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, ইউএসএ

মন্তব্য

এ-বিশ্লেষণ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, রোটাভাইরাস এখনো বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, যার ফলে প্রতিবছর ৫,৭০০ থেকে ১৩,৪০০ জন শিশু মারা যায়। আনুমানিক এ-হিসাবসমূহ ১৯৯০ দশকের প্রারম্ভে ইউনিকম্ব পরিচালিত বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত সংখ্যার (১৪,৮৫০ থেকে ২৭,০০০) থেকে কম। এতদসত্ত্বেও, আমাদের এ-উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, নিরাপদ এবং কার্যকর একটি রোটাভাইরাস ভ্যাকসিন প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রতিবছর ডায়রিয়ায় আক্রান্ত কয়েক হাজার শিশুর মৃত্যু রোধ করা এবং হাসপাতালে যাওয়া থেকে বিরত রাখা সম্ভব হতে পারে।

ইউনিকম্ব-এর গবেষণা থেকে প্রাপ্ত হারের তুলনায় এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত উপাত্তে দেখা যায় যে, রোটাভাইরাসে মৃত্যুর হার আগের চেয়ে কম এবং ডায়রিয়ার ফলে বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার আগের চেয়ে কমে গেছে। বাংলাদেশে আনুমানিক ২৫% শিশুমৃত্যুর কারণ ডায়রিয়া – এরূপ একটি ধারণার ওপর ভিত্তি করে ইউনিকম্ব তার গবেষণার ফলাফল হিসাব করেন। অথচ সাম্প্রতিক উপাত্ত থেকে আমরা এ-সংক্রান্ত হার পেয়েছি আনুমানিক ৫%-১০%। সত্যি বলতে কী, আমাদের উপাত্ত থেকে বোঝা যায় যে, যেখানে বাংলাদেশে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুমৃত্যুর হার কমে গেছে, সেখানে রোটাভাইরাসের ফলে ডায়রিয়ায় মৃতের সংখ্যা আসলে বেড়ে গেছে এবং যতজন ডায়রিয়ায় মারা যায় তার প্রায় ৪০% মারা যায় কেবলমাত্র রোটাভাইরাসজনিত ডায়রিয়ায়।

আমাদের গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, রোটাভাইরাসের ফলে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাংলাদেশী শিশুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার দরুণ অন্যান্য কারণে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিশুর সংখ্যা কমে গেছে। তবে রোটাভাইরাসে আক্রান্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মোট রোগীর সংখ্যা বরং বাড়ে নি। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, যেহেতু জীবাণু এবং পরজীবীঘটিত ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণে পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশন উন্নয়ন-সংক্রান্ত ইন্টারভেনশন কর্মসূচির একটি ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান। কারণ জীবাণু এবং পরজীবীঘটিত ডায়রিয়া প্রধানত দূষিত খাবার এবং পানীয়ের মাধ্যমে ছড়ায়। তবে রোটাভাইরাসের নিয়ন্ত্রণে উল্লিখিত ইন্টারভেনশন কর্মসূচির প্রভাব অপেক্ষাকৃত অনেক কম, কারণ ভাইরাসটি প্রায়ই ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়। অধিকন্তু, খুব ঘন ঘন বমি হওয়ার দরুণ রোটাভাইরাসে আক্রান্ত শিশুদেরকে মুখে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়ানো প্রায়ই আরো কঠিন একটি কাজ। তাছাড়া, রোটাভাইরাস-প্রতিরোধক কার্যকর কোনো জীবাণুনাশক ওষুধও নাই। সাম্প্রতিককালে বৈশ্বিক-উপাত্ত নিয়ে একটি পর্যালোচনায়ও মারাত্মকভাবে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে রোটাভাইরাসজনিত আক্রান্তের হার একইরকমভাবে বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে (১০)।

বাংলাদেশ জনমিতি এবং স্বাস্থ্য সমীক্ষায় মৌখিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ে অনিশ্চয়তার ফলে এই গবেষণার ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে রোটাভাইরাসে মৃত্যু-সংক্রান্ত দু'ধরনের তথ্যই আমরা এখানে তুলে ধরেছি। এক, রক্ষণশীল উপায়ে পাওয়া কম মৃত্যুহার এবং দুই, বিভিন্ন অনুমানের ওপর ভিত্তি করে পাওয়া বেশি হার।

নতুন রোটাভাইরাস ভ্যাকসিনসমূহ যদি উচ্চমাত্রায় পুষ্টিহীনতায় জর্জরিত ও খারাপ পয়ঃনিষ্কাশনসম্বলিত স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠির মধ্যে কার্যকর প্রমাণিত হয় এবং সেগুলো যদি ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সহজলভ্য হয়, তাহলে বাংলাদেশে শিশুদের জন্য নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির আওতায় রোটাভাইরাসের টিকাও শিশুদেরকে দেওয়া যেতে পারে, যার ফলে প্রতিবছর হাজার হাজার শিশুর জীবন রক্ষা পেতে পারে। ১৯৯৩ এবং ২০০৪ সালের মধ্যে ডায়রিয়াজনিত কারণে

মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেলেও যেহেতু রোটাভাইরাসে আক্রান্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমে নি, তাই বাংলাদেশে ডায়রিয়ার ফলে শিশুদের মারাত্মক অসুস্থতা এবং মৃত্যুহার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে যে সফলতা অর্জিত হয়েছে তা ধরে রাখার জন্য রোটাভাইরাস প্রতিরোধের লক্ষ্যে আরো ইন্টারভেনশন কার্যক্রম প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, রোটাভাইরাসের টিকাদান কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে যার ফলে বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যে মারাত্মক ডায়রিয়ায় আক্রান্তের হার এবং মৃত্যুঝুঁকি কমে যাবে বলে আশা করা যায়।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নবজাতক শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি

বাংলাদেশে যেসব শিশু পাঁচ বছরের কম বয়সে মারা যায় তাদের প্রায় অর্ধেকই নবজাতক (০ থেকে ২৮ দিন বয়সী)। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে একটি বড় বেসরকারি সংস্থার কর্মএলাকায় নবজাতক মৃত্যুর কারণসমূহ নির্ধারণের জন্য এই কেস-কন্ট্রোল গবেষণাটি পরিচালিত হয়। ২০০৩ সালে যেসব শিশু জন্মের ২৮ দিনের মধ্যে মারা গেছে (১৪২ জন) এবং যারা মারা যায় নি (৬১৭ জন কন্ট্রোল গ্রুপে) তাদের মায়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। যেসব মা একবারে একটি সন্তান প্রসব করেছেন সেসব শিশুর মধ্যে নবজাতক মৃত্যুর প্রধান ঝুঁকিসমূহ ছিলো প্রসবকালীন জটিলতা (অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও ৩.১ [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেলস: ১.৮-৫.৩]), অপরিপক্কতা (অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও ৮.৩ [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেলস: ৪.২-১৬.৫]), অসুস্থ শিশুর জন্য লাইসেন্সবিহীন সনাতনী চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসসেবা গ্রহণ করা (অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও ৫.৯ [কনফিডেন্স ইন্টারভেলস: ১.৩-২৬.৩]) অথবা অসুস্থ শিশুর জন্য কোনো চিকিৎসাসেবা না নেওয়া (অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও ২৩.৩ [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেলস: ৩.৯-১৩৭.৪])। গবেষণালব্ধ ফলাফলে যেসব প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে তা হলো– যেসব শিশুর মৃত্যুর ঝুঁকি খুব বেশি তাদেরকে খুঁজে বের করা, কমিউনিটি এবং বাড়ি-নির্ভর ইন্টারভেনশন চালু করা এবং কার্যকর রেফারেল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

বাংলাদেশে নবজাতক (০ থেকে ২৮ দিন বয়সী) মৃত্যুর হার এক বছরের কম-বয়সী মোট শিশুমৃত্যুর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এবং পাচঁ বছরের কম-বয়সী মোট শিশুমৃত্যুর মধ্যে এ-সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও জনমিতি জরিপ (বিডিএইচএস)-এর হিসাব অনুযায়ী নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি ১,০০০ শিশুর মধ্যে ২৮ দিনের কমবয়সী মারা যাওয়া শিশুর সংখ্যা) ১৯৯০ দশকের প্রারম্ভে কমে যায়, কিন্তু ১৯৯৫-১৯৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০৩ সাল পর্যন্ত এ-হার ৪১ থেকে ৪২-এর মধ্যে স্থিতিশীল থাকে (১,২,৩)। জাতিসংঘ ঘোষিত শিশুমৃত্যু কমানো-সংক্রান্ত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল) পৌঁছাতে বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা প্রয়োজন (৪)।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের যেখানে ২৭টি বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) কর্মরত ছিলো সেখানে ১৯৯৬ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত নবজাতক মৃত্যুর হার প্রায় ৫০% কমে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে (৫)। ২০০৩ সালে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে নবজাতকমৃত্যুর হারের তুলনায় উল্লিখিত স্থানে এ-হার ছিলো প্রতি ১,০০০ জনে ৩০ জন। এ-হার অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার আংশিক কারণ সম্ভবত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যাপক বিস্তার; যদিও সন্তান জন্মদানে অপেক্ষাকৃত লম্বা বিরতি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন অথবা পর্যাপ্ত পুষ্টি-প্রাপ্তি এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার মতো সম্ভাবনাময় অন্যান্য বিষয়ও সেখানে অন্তর্ভুক্ত ছিলো। যেসব স্থানে ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে সেসব স্থানে নবজাতকমৃত্যুর সম্ভাব্য কারণসমূহ নির্ধারণ করে বাংলাদেশে নবজাতকদের বাঁচিয়ে রাখার অভিপ্রায়ে ইন্টারভেনশন কর্মসূচি যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করার লক্ষ্যে এ-গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ পপুলেশন অ্যান্ড হেলথ কনসোরশিয়াম[১] (ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ) ২০০০ সালে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে উল্লিখিত কাজের জন্য ২৭টি এনজিওকে চুক্তিভুক্ত করে। এসব এনজিওর অধিকাংশই কয়েক বছর ধরে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা লাভ করেছে। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তারা ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, ইউকে-এর আর্থিক সহায়তায় সমগ্র বাংলাদেশের ২৭টি এলাকায় ১৫ থেকে ৪৯ বছর-বয়সী প্রায় ৩৩০,০০০ বিবাহিত মহিলাকে সরকার-প্রদত্ত প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার অধিকাংশ প্রদান করেছে। বাংলাদেশ পপুলেশন অ্যান্ড হেলথ কনসোরশিয়াম উল্লিখিত এনজিওসমূহকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে এবং ১৯৯৬ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী গ্রুপের (টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ) পরামর্শ অনুযায়ী তাদের মাঠকর্মী ও প্যারামেডিকরা নবজাতকদের সেবা-সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করেছেন (৬)। এছাড়া নবজাতকমৃত্যু রোধে এনজিওসমূহের অন্য কোনো বিশেষ ধরনের ইন্টারভেনশন বা কার্যাবলি ছিলো না।

এনজিওসমূহের স্বাস্থ্যসেবা-সংক্রান্ত কার্যাবলি স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সাথে পুরোপুরিভাবে সমন্বিত ছিলো এবং কমিউনিটিতে প্রদত্ত সেবাসমূহ (মাঠকর্মী এবং ভ্রাম্যমান ক্লিনিক-সংক্রান্ত) বর্তমান কলাকৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো। এনজিওসমূহ যেসব এলাকায় কাজ করেছে সেসব এলাকায় কোনো সরকারি মহিলা মাঠকর্মী ছিলো না। তবে এনজিওসমূহ ওইসব মাঠকর্মীদের মতো পারিবারিক স্বাস্থ্য পরিদর্শনকারী নিয়োগ করেছে যারা বাড়িতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-সংক্রান্ত মূল পরামর্শ প্রদান করেছেন এবং এনজিওসমূহের ভ্রাম্যমান ক্লিনিক এবং সেগুলোতে বিদ্যমান উচ্চ পর্যায়ের সুযোগ-সুবিধাসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধি করার কাজে সচেষ্ট ছিলেন। প্রত্যেকটি এনজিও এলাকায় একজন প্যারামেডিক প্রতিমাসে প্রায় ১৮টি ভ্রাম্যমান ক্লিনিক পরিচালনা করেছেন, যেসব ক্লিনিক থেকে পরিবার পরিকল্পনা, গর্ভকালীন এবং গর্ভোত্তর সেবাসমূহ এবং রোগ থেকে আরোগ্যলাভের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক নিরাময়মূলক সেবা প্রদান করা হয়েছে। গবেষণায় নিযুক্ত ১২টি এনজিওর মধ্যে নয়টির প্রত্যেকটিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে (জনসংখ্যা ২৫,০০০) একটি করে স্থায়ী ক্লিনিক ছিলো। যেসব স্থানে স্থায়ী ক্লিনিক ছিলো না সেসব স্থান থেকে মহিলা এবং শিশুদেরকে উপজেলা হাসপাতালে (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স) পাঠানো হয়েছে।

যে জন্য গবেষণায় নিযুক্ত ১২টি এনজিও বাছাই করা হয়েছে তা হলো– তারা একই এলাকায়

[১]বর্তমানে স্বাস্থ্য এবং উন্নয়ন-এর অংশীদার একটি স্বাধীন এনজিও

অন্ততপক্ষে ১৯৯৬ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছে। স্থানীয় সরকারি স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের দ্বারা এলাকাসমূহ এনজিওসমূহের মধ্যে বন্টন করা হয়। কারণ, এলাকাসমূহ উপজেলা হাসপাতাল থেকে অনেক দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত অথবা সরকারের পক্ষে সেসব স্থানে সেবা পৌঁছে দেওয়া কঠিন ছিলো। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ১২টি উপজেলার ৮৫টি ইউনিয়নে এনজিওসমূহ কর্মরত ছিলো। এনজিওসমূহের উদ্দেশ্য ছিলো প্রায় ১০৫,০০০টি বাড়ির সব লোকজনকে সেবা প্রদান করা। ২০০৩ সালে ১২টি গবেষণা এলাকায় নিবন্ধনকৃত প্রজননক্ষম (১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী) ৯৬,৬৪২ জন বিবাহিত মহিলার মধ্যে ১১,২৫৩ জন জীবিত সন্তান প্রসব করেন।

গবেষণার জন্য একটি কেস-কন্ট্রোল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এবং ২০০৩ সালে ২৮ দিনের মধ্যে মৃত্যুবরণকারী শিশু ও তাদের মা এবং যারা ওই সময়ের মধ্যে মারা যায় নি সেসব শিশু ও তাদের মায়েদেরকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যমজ শিশুদেরকে সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা নির্ধারণে জটিলতা থাকার দরুন শুধুমাত্র যেখানে একবারে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে সেসব শিশুকে এ-গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মৃত্যুবরণকারী নবজাতকদের আনুমানিক ২০১ জন মায়ের মধ্যে ১৮৪ জনকে সনাক্ত করা গেছে এবং ১৪২ জনের (৭১%) সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে (৫২ জন বাড়ি থেকে দুরে কোথাও চলে গেছেন বা মারা গেছেন অথবা অনুপস্থিত ছিলেন)। প্রতিবেশী কন্ট্রোল গ্রুপের জন্য মৃত্যুবরণকারী প্রত্যেক নবজাতকের বিপরীতে দু'টি জীবিত শিশু নির্বাচিত করা হয়েছে যারা ২০০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেছে এবং একই গ্রামে একই মাঠকর্মীর পর্যবেক্ষণে ছিলো। যে মা একবারে একটি শিশু জন্ম দেওয়ার পর শিশুটি মারা গেছে, এমন ১২২ জন মা এবং তাদের বিপরীতে ২৪১ জন প্রতিবেশী কন্ট্রোল গ্রুপের মায়ের সাক্ষাৎকারের প্রতিবেদন আমরা এখানে তুলে ধরেছি (একজন মৃত নবজাতকের বিপরীতে দু'জন জীবিত নবজাতককে কন্ট্রোল গ্রুপে রাখার কথা থাকলেও ২০০৩ সালে তিনটি গ্রাম থেকে মাত্র একজন করে তিনজন নবজাতক পাওয়া গেছে)। মৃত নবজাতকদের বাড়ি থেকে দুরে যে এলাকায় এনজিও কর্মরত ছিলো সেখানকার অন্যান্য মাঠকর্মীর দ্বারা নিবন্ধনকৃত তালিকা থেকে ২০০৩ সালে একজন মৃত নবজাতকের বিপরীতে দু'জন করে জীবিত নবজাতককে দৈবচয়নের (লটারি) ভিত্তিতে প্রতিবেশী নয় এমন (নন-নেইবরহুড) কন্ট্রোল গ্রুপের জন্য নির্বাচন করা হয়। এভাবে ৩৭৬ জন নবজাতকের মায়ের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। মাঠ পর্যায়ের কাজ (যার মধ্যে মায়েদের সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত) ২০০৪ সালের মে থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়।

নবজাতকের মৃত্যুর কারণ মূল্যায়নের জন্য বাইভেরিয়েট অ্যানালাইসিস থেকে মাল্টিপল লজিস্টিক রিগ্রেশন অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক, জনমিতিক এবং অন্যান্য তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিবেশী নয় এমন কন্ট্রোলের ওপর ভিত্তি করে আমরা নবজাতকের মৃত্যুর ঝুঁকি-সম্পর্কিত আনুমানিক হিসাব এখানে তুলে ধরেছি অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও অনুযায়ী (প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান বা বিষয়ের সাথে সমন্বয় করে), যদিও উভয় শ্রেণীর কন্ট্রোলের ওপর প্রাপ্ত আনুমানিক হিসাব সারণি ২-এ দেখানো হয়েছে।

মৃত্যুবরণকারী (কেস) এবং কন্ট্রোল উভয় গ্রুপের নবজাতকদের মাকে মাতৃস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রাথমিক সেবাসমূহ দেওয়ার হার ছিলো অনেক বেশি (সারণি ১)। মহিলাদের কাছ থেকে জানা যায় যে, এনজিও স্বাস্থ্যকর্মীরাই ছিলো মা এবং নবজাতকের সেবা-সংক্রান্ত উপদেশের প্রধান উৎস। এক্ষেত্রে উভয় গ্রুপের ৩৭-৪০ শতাংশ মা বলেছেন যে, তারা এনজিও মাঠকর্মীদের পরামর্শ নিয়েছেন এবং উভয় গ্রুপের প্রায় সমসংখ্যক মা বলেছেন যে তারা গর্ভকালীন সময়ে প্যারামেডিকদের সেবা এবং

পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। মৃত্যুবরণকারী এবং কন্ট্রোল উভয় গ্রুপের মায়েদের কাছ থেকে জানা যায় যে, তারা এনজিও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে একই ধরনের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন (এখানে উপাত্ত দেখানো হয় নি)।

সারণি ১: ২০০৩ সালে মাতৃস্বাস্থ্য সেবার ব্যবহার (মৃত্যুবরণকারী নবজাতকদের মা এবং কন্ট্রোল গ্রুপের একটি শিশু জন্মদানকারী মায়েদের প্রতিবেদন)

প্রাপ্ত মাতৃস্বাস্থ্য সেবা	মৃত্যুবরণকারী নবজাতকদের মা % (৯৫% সিআই) সংখ্যা=১২২	প্রতিবেশী কন্ট্রোল গ্রুপের মা % (৯৫% সিআই) সংখ্যা=২৪১	প্রতিবেশী নয় এমন কন্ট্রোল গ্রুপের মা % (৯৫% সিআই) সংখ্যা=৩৭৬
১+ গর্ভকালীন সেবা[১]	৯২.৬ (৮৮.০-৯৭.২)	৯১.৭ (৮৮.২-৯৫.২)	৯৪.১ (৯১.৭-৯৬.৫)
এনজিও ক্লিনিকে প্রদত্ত গর্ভকালীন সেবা	৮৬.৯ (৮০.৯-৯২.৯)	৮২.৬ (৭৭.৮-৮৭.৪)	৮৯.১ (৮৫.৯-৯২.৩)
৩+ গর্ভকালীন সেবা	৬৭.২ (৫৮.৯-৭৫.৫)	৬৯.৩ (৬৩.৫-৭৫.১)	৭২.৩ (৬৭.৮-৭৬.৮)
ধনুষ্টংকারের টিকা প্রদান	৮৮.৫ (৮২.৮-৯৪.২)	৯২.৯ (৮৯.৭-৯৬.১)	৯১.২ (৮৮.৩-৯৪.১)
সেবাকেন্দ্রে (প্রাতিষ্ঠানিক) প্রসব[২]	১২.৩ (৬.৫-১৮.১)	৬.৩ (৩.২-৯.৪)*	৪.৫ (২.৪-৬.৬)*
প্রশিক্ষিত ধাত্রী কর্তৃক বাড়িতে প্রসব	১.৯ (০.০-৭.৩)	২.৭ (০.৬-৪.৭)	৩.৯ (১.৯-৫.৯)
তিন দিনের মধ্যে গর্ভোত্তর সেবা	১১.৫ (৩.৮-১৯.২)	১১.২ (৭.২-১৫.২)	১৩.৩ (৯.৯-১৬.৭)

[১] যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক কর্তৃক গর্ভকালীন সেবা (প্যারামেডিক অথবা এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা)

[২] সরকারি সেবাদানকেন্দ্র অথবা ব্যক্তিমালিকানাধীন/এনজিও ক্লিনিকে প্রসব

* মৃত্যুবরণকারী নবজাতকদের মায়ের তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে কম (পি=<০.০৫); জটিল রোগীদের অন্যত্র রেফার করাসহ

সারণি ২: বিভিন্ন কারণে নবজাতক মৃত্যুর অনুমিত ঝুঁকি

নবজাকত মৃত্যুর মূল কারণসমূহ	অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেলস্)[১] নবজাকত মৃত্যুর অনুমিত আপেক্ষিক ঝুঁকি	
	প্রতিবেশী কন্ট্রোল	প্রতিবেশী নয় এমন কন্ট্রোল
পূর্ববর্তী শিশুকে হামের টিকা দেওয়া হয় নি[২]	১৫.১* (৩.৫-৬৫.৪)	৩২.৩* (৭.৪-১৪২.৯)
২+ পূর্ববর্তী শিশু মারা গিয়েছে/মৃতজন্ম হয়েছে	১.৮ (০.৯-৩.৭)	১.৬ (০.৮-৩.২)
প্রসব-সংক্রান্ত যেকোনো জটিলতা	২.৬* (১.৫-৪.৫)	৩.১* (১.৮-৫.৩)
আট মাসের কম সময় গর্ভবতী	৬.৭* (৩.৩-১৩.৭)	৭.৭* (৩.৮-১৫.৩)
হাতুড়ে ডাক্তারের (কবিরাজ) কাছ থেকে সেবা গ্রহণ[৩]	২.৯ (০.৯-৯)	৫.৯* (১.৩-২৬.৩)
মারাত্মক অসুস্থতার ক্ষেত্রেও চিকিৎসা নেয় নি	**	২৩.৩* (৩.৯-১৩৭.৪)

[১] পৃথক নমুনাসমূহের (মায়ের বয়স, বাবা মায়ের শিক্ষা, পারিবারিক ব্যয় ও সদস্য সংখ্যা, রেডিও/টিভি আছে কি না, মোট গর্ভের সংখ্যা, গর্ভকালীন সেবা প্রাপ্তির সংখ্যা, প্রসবকালীন যেকোনো জটিলতা, গর্ভকালীন সময়, শিশুর লিঙ্গ) বাইভেরিয়েট অ্যানালাইসিস থেকে প্রাপ্ত সকল তাৎপর্যপূর্ণ কারণসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে

[২] মায়েরা জানিয়েছেন যে তাদের পূর্ববর্তী কোনো শিশু মারা যায় নি

[৩] শিশু গুরুতর অসুস্থ মনে করে চিকিৎসাসেবা নেওয়া হয়েছে: রেফারেন্ট গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত শিশুরা সেবাদান কেন্দ্রের যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসাসেবা নিয়েছেন (এনজিও, ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং সরকারি ক্লিনিক/হাসপাতালের প্যারামেডিক এবং এমবিবিএস ডাক্তার)

* ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেলস এবং অডস্ রেশিও-র ভিত্তিতে পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ঝুঁকি

** সকল কন্ট্রোল মা সেবা চেয়েছেন: কেস মায়েদের মধ্যে ২৯.৭% সেবা চান নি

যেসব মায়ের দুই বা ততোধিক সন্তান মারা গেছে অথবা যারা মৃতসন্তান প্রসব করেছেন তাদের বেলায় নবজাতকের মৃত্যুঝুঁকি ছিলো দ্বিগুণ, যদিও অন্যান্য বিষয় নিয়ন্ত্রণের পর এটি আর তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো না (অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও ১.৬ [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ০.৮-৩.২])। কন্ট্রোল গ্রুপের মায়েদের তুলনায় যেসব মায়ের নবজাতক মারা গেছে তাদের মধ্যে আনুপাতিক হারে অনেক বেশি মা প্রসবের সময় কমপক্ষে একটি জটিলতার সম্মুখীন হয়েছেন যা নবজাতকের মৃত্যু-সংক্রান্ত ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে (অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও, ৩.১ [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেলস: ১.৮-৫.৩])। যেসব শিশু মারা গেছে তারা জন্মের সময় খুব সম্ভবত স্বল্পওজনবিশিষ্ট অপরিপক্ক ছিলো এবং মায়েদের আট মাসের কম সময়ের প্রসব নবজাতকের মৃত্যুঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলো (অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও ৭.৭ [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেলস: ৩.৮-১৫.৩])। যমজ নবজাতকের ক্ষেত্রে মৃত্যুহার একটি নবজাতকের তুলনায় ১৫ গুণ বেশি (প্রতি ১,০০০ জনে ২৮৩ জন) ছিলো।

যেসব শিশু মারা গেছে তাদের মৃত্যুর দিন বোঝা গেছে যে, তাদের অসুস্থতা শুরু হয়েছিলো বেশ আগে থেকেই (প্রথম দিনে ৫৫.৯% এবং প্রথম সাত দিনে ৮৭.৩%) (প্রথম ২৪ ঘন্টায় ৪০.২% এবং প্রথম সাত দিনে ৭২.১%)। মৃত্যুবরণকারী নবজাতকদের মা (৪৬.৬%) এবং কন্ট্রোল গ্রুপের মায়েদের (৩০.৩%) কাছ থেকে প্রায়ই জানা যায় যে, তাদের নবজাতকরা শাসকষ্টে ভুগছিলো। বাংলাদেশ পপুলেশন অ্যান্ড হেলথ কনসোরশিয়াম-এর অধীনে ২৭টি এনজিওর মধ্যে মাত্র কয়েকটি এনজিও ২০০৩ সালে ৬৬২ জন নবজাতকের মধ্যে মাত্র ৩৮১ জনের মৃত্যু-সংক্রান্ত তথ্য (ভারবাল অটোপসি) সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করেছে। নবজাতকদের মৃত্যুর প্রধান যেসব কারণ রেকর্ড করা হয়েছে সেগুলো হলো– জন্মের সময় শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া (৩৮.৬%), স্বল্পওজন থাকা (২৭.৮%) এবং সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়া (১৪.৭%), যেমন– তীব্র শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ (৬.৮%), জন্ডিস (৩.৪%), উদরাময় রোগ (১.৬%), শরীরে পচন (জীবাণুঘটিত সংক্রমণ) (সেপসিস) (১.৬%), এবং ধনুষ্টংকার (১.৩%)। বারটি গবেষণা এলাকা থেকে প্রাপ্ত মায়েদের নিজস্ব প্রতিবেদনের মধ্যে যে বড় একটি পার্থক্য বিরাজমান তা হলো– কিছু মা তাদের নবজাতকের মারাত্মক অসুস্থতা এবং মৃত্যুকে 'শয়তানের আছর' (এভিল স্পিরিট)-এর সাথে তুলনা করেছেন। ২৪ জন মা সবাই তাদের সন্তানের মৃত্যুর জন্য শয়তানের আছরকে দায়ী করেছেন, তারা সবাই বলেছেন যে, এভাবে তারা ইতোপূর্বে কমপক্ষে একজন শিশু হারিয়েছেন। আবার কেউ কেউ দুই বা তিনজনও হারিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

মায়েদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে যে, তাদের শিশুর অসুস্থতা যখন মারাত্মক হিসেবে বিবেচনা করেছেন, তখন তারা কোনো চিকিৎসা সুবিধা নিয়েছেন কি না। কন্ট্রোল গ্রুপের মায়েদের তুলনায় (৮%) মৃত্যুবরণকারী নবজাতকদের মায়েরা (২১%) খুব সম্ভবত অনেকে কবিরাজ হিসেবে পরিচিত লাইসেন্সবিহীন সনাতনী চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন। শিক্ষিত ডাক্তারদের কাছ থেকে চিকিৎসা না নিয়ে যারা সনাতনী চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন তাদের নবজাতকের মৃত্যুঝুঁকি ছিলো অনেক বেশি (অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও ৫.৯% [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেলস: ১.৩-২৬.৩])। যদিও কন্ট্রোল গ্রুপের প্রায় সব মা (৯৮-১০০%) তাদের শিশুর মারাত্মক অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা-সেবা নিয়েছেন, মৃত্যুবরণকারী নবজাতকদের মায়ের মধ্যে ৩৫ (৩০%) জন তাদের সন্তানদের জন্য তা নেন নি। চিকিৎসা-সেবা না নেওয়ার সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি ছিলো অনেক বেশি (অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও ২৩.৩ [৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেলস: ৩.৯-১৩৭.৪%])। এসব শিশুর বেশিরভাগই তাদের জন্মের খুব অল্প সময়ের মধ্যে মারা যায় (প্রথম ২৪ ঘন্টায় ৩৫ জনের মধ্যে ২১ জন) এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের মা বলেছেন যে, চিকিৎসা-সেবা নেওয়ার জন্য তাদের হাতে খুব কম সময় ছিলো।

নবজাতকমৃত্যুর জন্য দায়ী সবচেয়ে শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে গর্ভকালীন সময়ে যা বিবেচনা করা

হয়, তাহলো– পূর্ববর্তী শিশুকে হামের টিকা না দেওয়া। এক্ষেত্রে মৃত্যুবরণকারী নবজাতকদের মায়ের সংখ্যা ৫৩%, যার তুলনায় কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের মায়ের সংখ্যা ৯%। নবজাতকের মৃত্যুর ঝুঁকি ছিলো অত্যন্ত বেশি: অ্যাডজাস্টেড অডস্ রেশিও ৩২.৩ (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেলস: ৭.৪-১৪২.৯)। যেসব নবজাতকের পূর্ববর্তী ভাই বা বোনকে টিকা দেওয়া হয় নি সেসব নবজাতকের আনুমানিক মৃত্যুহার ছিলো প্রতি ১,০০০ জনে ৫৪ জন, যার তুলনায় অন্য শিশুদের এ-হার ছিলো প্রতি ১,০০০ জনে নয় জন। উচ্চ মৃত্যুহারের জন্য সম্ভবত অনেকগুলো বিষয়ই দায়ী ছিলো; যদিও সাধারণত মনে হয় যে, এসব মায়ের গর্ভকালীন সময়ে যদি তাদেরকে বিশেষ পরামর্শ প্রদান করা হতো তাহলে তা তাদের শিশুর জন্য স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করতো। একইভাবে মারাত্মক অসুস্থ নবজাতকের জন্য যখন সনাতনী চিকিৎসকের চিকিৎসা নেওয়া হয়েছে অথবা কোনো চিকিৎসাই নেওয়া হয় নি সেক্ষেত্রে তাদের আনুমানিক মৃত্যুহার ছিলো প্রতি ১,০০০ জনে ৭৫ জন। পক্ষান্তরে, যারা শিক্ষিত ডাক্তারদের চিকিৎসা নিয়েছে তাদের বেলায় মৃত্যুহার ছিলো প্রতি ১,০০০ জনে ৩৬ জন। এটি পরিস্কার যে, সবধরনের মারাত্মক অসুস্থতাই জীবন-বিধ্বংসী নয়। তবে গবেষণা এলাকায় প্রায় ৩৩% পর্যন্ত নবজাতকের মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হতো যদি সেখানে নবজাতকদের মা কোনো শিক্ষিত ডাক্তার বা প্যারামেডিকের কাছ থেকে চিকিৎসা সহায়তা পেতে সমর্থ হতেন (এক্ষেত্রে ১৮ জন মা তাদের অভ্যাস পাল্টিয়ে একটি মৃত্যু রোধ করতে পেরেছেন)। তবে অনেক সময়ই একজন শিক্ষিত ডাক্তার বা প্যারামেডিক খুব সহজে নাও পাওয়া যেতে পারে।

প্রতিবেদক: হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, ইউকে

মন্তব্য

এ-গবেষণা থেকে জানা যায় যে, যেসব এলাকায় নবজাতকের মৃত্যুহার আগে থেকেই তুলনামূলকভাবে কম আছে এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে সেসব এলাকায় নবজাতকের মৃত্যুরোধ করার সুযোগ রয়েছে। যেসব শিশুর উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে আসার সম্ভাবনা থাকে, মায়েদেরকে গর্ভকালীন সেবা প্রদানের সময় তাদেরকে সনাক্ত করা যেতে পারে এবং সম্ভাব্য মৃত্যুঝুঁকি এড়াতে তাদের মাকে বিশেষ পরামর্শ প্রদান করা যেতে পারে (ওইসব মায়ের মধ্যে রয়েছেন তারা, যারা ইতোপূর্বে তাদের সন্তান হারিয়েছেন অথবা তাদেরকে হামের টিকা দেন নি)। প্রসবে সাহায্যকারী ব্যক্তি (পরিচর্যাকারী বা ধাত্রী) উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ (একের অধিক প্রসব, অপরিপক্ক/ছোট শিশু, প্রসব-জটিলতা) শিশু নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারে। প্যারামেডিকদের দ্বারা মায়েদেরকে স্ব স্ব বাড়িতে অনতিবিলম্বে গর্ভোত্তর সেবা দেওয়া যেতে পারে এবং যেসব এলাকায় কোনো এনজিও কর্মরত সেসব এলাকায় এটি সহজে করা যেতে পারে। নবজাতকের মুখে মুখ লাগিয়ে দম দেওয়ার (রিসাসসিটেশন) ওপর প্রশিক্ষণ পরিচর্যাকারী বা ধাত্রীদেরকে শ্বাসরোধ-সংক্রান্ত কিছু মৃত্যু রোধ করতে সহায়তা করতে পারে। বিপজ্জনক লক্ষণসমূহ সম্পর্কে এবং বাড়িতে বসে নবজাতককে সেবা-শুশ্রূষা করার বিষয়ে মায়েদের উন্নত জ্ঞান থাকলে এবং মারাত্মক অসুস্থ শিশুদের চিকিৎসার জন্য শিক্ষিত ডাক্তারদের কাছ থেকে চিকিৎসা নিতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে নবজাতকের মৃত্যু আরো রোধ করা যেতে পারে। জরুরি ধাত্রীবিদ্যা এবং নবজাতকের চিকিৎসা-সেবা প্রদানের লক্ষ্যে উপজেলা সরকারি হাসপাতালের দক্ষতা উন্নয়নের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসংখ্যা বাড়ানো হবে নবজাতকের মৃত্যুরোধ করার একটি যুক্তিসংগত কৌশল।

যদিও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহারের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে নবজাতক মৃত্যুহার কমিয়ে আনা সম্ভব, তথাপি বাড়ি এবং কমিউনিটিতে অতিরিক্ত কলা-কৌশল প্রয়োগ করলে এ-ব্যাপারে আরো সফলতা অর্জন করা যাবে। আইসিডিডিআর,বি-র 'প্রজন্ম প্রকল্প' এবং সেভ দি

চিলড্রেন-এর 'নবজাতকের জীবন বাঁচানোর উদ্যোগ' কর্মসূচিসমুহের মাধ্যমে বাংলাদেশে নতুন কলা-কৌশল উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলছে। যেসব এনজিও এলাকায় নবজাতক ও তাদের মায়ের জন্য চিকিৎসা-সেবা ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে সেসব এলাকায় ওইসব কলা-কৌশল বাস্তবায়ন করা যেতে পারে, নবজাতকের মৃত্যুর ওপর তা সর্বোচ্চ কতখানি প্রভাব ফেলে সেটি মূল্যায়নের জন্য।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন।

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা'র প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাদকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো প্রতিফলিত হয়। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্যগবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতার অনুপাত: মার্চ ২০০৫-ফেব্রুয়ারি ২০০৬

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা=২০৫)	*ভি. কলেরি* O১ (সংখ্যা=৮৫১)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	৩৪.১	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৯৯.৫	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৫৫.৬	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৪১.৫	১.৮
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	১০০.০	১০০.০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	২২.৯
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৩৬.২
ফুরাজোলিডোন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.৪

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি **O১**, শিগেলা *এবং রোটাভাইরাস-এর তুলনামূলক চিত্র: মার্চ ২০০৫-ফেব্রুয়ারি ২০০৬*

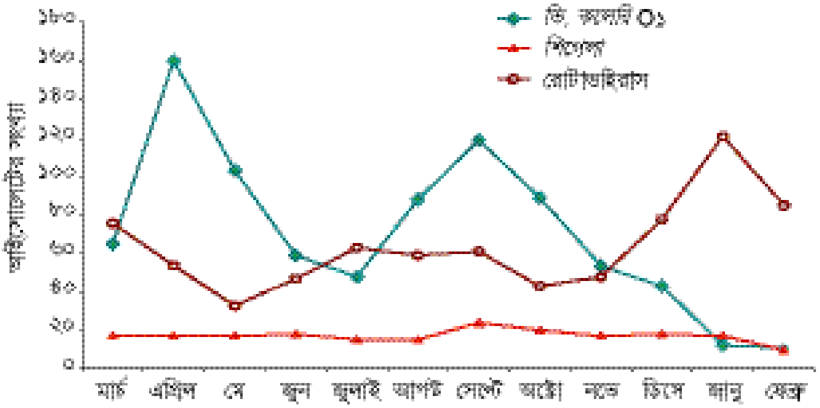

৮৭টি এম. টিউবারকিউলোসিস *জীবাণুর ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ধরন: জুন ২০০৪*-ডিসেম্বর ২০০৫

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন প্রাইমারি (সংখ্যা=৭৩)	একোয়ার্ড* (সংখ্যা=১৪)	মোট (সংখ্যা=৮৭)
স্ট্রেপটোমাইসিন	২১ (২৮.৮)	৪ (২৮.৬)	২৫ (২৮.৭)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	১২ (১৬.৪)	৩ (২১.৪)	১৫ (১৭.২)
ইথামবিউটল	১২ (১৬.৪)	৩ (২১.৪)	১৫ (১৭.২)
রিফামপিসিন	১২ (১৬.৪)	৪ (২৮.৬)	১৬ (১৮.৪)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	৫ (৬.৮)	২ (১৪.৩)	৭ (৮.০)
অন্যান্য ওষুধ	৩৪ (৪৬.৬)	৭ (৫০.০)	৪১ (৪৭.১)

( ) শতকরা হার *১ মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এন. গনোরিয়া *জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫ (সংখ্যা=১৩)*

জীবাণুনাশক ওষুধ	সংবেদনশীল (%)	কম সংবেদনশীলতা (%)	রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (%)
এজিথ্রোমাইসিন	১০০.০	০.০	০.০
সেফট্রিয়াক্সোন	১০০.০	০.০	০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৭.৭	০.০	৯২.৩
পেনিসিলিন	৩৮.৫	১৫.৪	৪৬.২
স্পেক্টিনোমাইসিন	১০০.০	০.০	০.০
টেট্রাসাইক্লিন	০.০	০.০	১০০.০
সেফিক্সিম	১০০.০	০.০	০.০

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি *জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: নভেম্বর ২০০৫-জানুয়ারি ২০০৬*

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীলতা সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (%)
এম্পিসিলিন	১৯	১৯ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	১৯	৪ (২১.০)	০ (০.০)	১৫ (৭৯.০)
ক্লোরামফেনিকল	১৯	১৯ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	১৯	১৯ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	১৯	১৯ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
জেন্টামাইসিন	১৯	১ (৫.০)	০ (০.০)	১৮ (৯৫.০)
অক্সাসিলিন	১৯	১৫ (৭৯.০)	৪ (২১.০)	০ (০.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি এবং শিশু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর এবং আইসিডিডিআর,বিকর্তৃক ঢাকার কমলাপুর ও টাঙ্গাইলের মির্জাপুর এলাকায় পরিচালিত নিউমোএডিআইপি সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী শিশুদের থেকে সংগৃহীত।

আইসিডিডিআর,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কেন্দ্রের পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকুল্যে এইচএসবি-এর এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (অসএইড), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ক্যানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সৌদি আরব, নেদারল্যান্ডস, শ্রীলংকা, সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ এজেন্সি (সিডা), সুইস ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

ছবি : আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজন রোটাভাইরাস রোগী (সৌজন্যে: ফকরুল আলম)

সম্পাদকমণ্ডলি	স্টিফেন পি. লুবি পিটার থর্প এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
সম্পাদনা বোর্ড	চার্লস পি লারসন এমিলি গারলী
অতিথি সম্পাদক	উমেস ডি. পারাসার
যাঁরা লেখা দিয়েছেন	ডব্লিউ আব্দুল্লাহ ব্রুক্স এবং স্টিফেন পি. লুবি গো তানাকা অ্যালেক মার্সার
কপি সম্পাদনা, বাংলা অনুবাদ এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা	এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
পেজ লে-আউট, ডেক্সটপ ও প্রি-প্রেস প্রসেসিং	মাহ্‌বুব-উল-আলম

আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ্ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
জিপিও বক্স নং ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

এ-সংখ্যাটির পিডিএফ এবং পূর্ববর্তী সকল সংখ্যার পিডিএফ-এর জন্য আমাদের ওয়েব সাইট ভ্রমণ করুন:
www.icddrb.org/hsb